Vol. 10 | No. 1 | 1966

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

গ্রন্থ-পরিচয়

Volume	10
Issue	1
Year	1966
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সিদ্দিক খান
Published online	June 15, 1966
DOI	10.62328/sp.v10i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v10i1.6
Pages	263-168
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয়

জনাব মনিরুদ্দীন ইউসুফ সাহেব সম্প্রতি মৌলানা রূমীর 'মসনবী'-শরীফের পরিচয়-সূচক একখানা পুস্তক রচনা করেছেন। ডঃ এনামুল হক সাহেবের বিস্তারিত ভূমিকা, আর ইউসুফ সাহেবের নিজের লেখা অবতরণিকা থেকে সেই যুগের পটভূমি এবং বিষয়বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা জন্মে। এই পূর্বাভাষ মসনবীর মর্ম-গ্রহণের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হ'য়েছে। তা'ছাড়া গ্রন্থকার তাঁর নির্বাচিত মসনবীগুলো ভাবানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে আবহ-ব্যাখ্যা দিয়ে পরতে পরতে মৌলানা রূমীর ভাব-সম্পদ উদ্‌ঘাটন ক'রেছেন।

মসনবী শরীফে বক্তব্যের একতা থাকলেও কাহিনীর একত্ব নাই। বোধ হয় এই কারণে বইয়ে সূচিপত্র দেওয়া হয়নি। তবু ভেবেচিন্তে ভূমিকা ও অবতরণিকার পরে কাহিনীগুলোর একটা সূচিপত্র দিয়ে দিলে মন্দ হ'ত না।

মসনবীর কাহিনীগুলো মুখ্য নয়, এ সবের ভিতর দিয়ে গূঢ় সত্যের আভাস দেখা যায়, তাই হ'ল আসল বস্তু। মানবজাতিকে শুনাবার জন্য মৌলানার মনে যে চিরন্তন-বাণী সঞ্চিত ছিল তাই প্রকাশ পেয়েছে মসনবী কাব্যে। বলা বাহুল্য এর মূল সুর ঐশীপ্রেম। আল্লাহ্ থেকে পৃথক হয়ে মানবাত্মার যে আকুলি-বিকুলি, প্রেম-সঙ্গীত, মিলনাভিলাষ,—তাই প্রকাশ পেয়েছে এতে অজস্র ঝারায়, বিচিত্র ভঙ্গীতে।

বাংলা ভাষায় মসনবী-শরীফের এ রকম ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আর চোখে পড়ে নাই। তাই এ পুস্তকখানা পাঠ ক'রে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইসলাম-জগত ও হযরত মোহাম্মদ সম্বন্ধে মৌলানা রূমীর মৌলিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে বিশেষ উপকৃত হ'য়েছি। কিন্তু লেখক যে মৌলানার কাব্যে "দেহ-আত্মার"

অভিন্নতার বাণী দেখতে পেয়েছেন, আমি ঐরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছবার তেমন কোনও অকাট্য যুক্তি বা উক্তির সন্ধান পাইনি। তবে ব্যাপারটা হচ্ছে অনুভূতি-জগতের, আর অমি কেবল কতকগুলো খণ্ডিত মসনবী ও তার তর্জমা মাত্র দেখেছি। কাজেই জোর করে কোন প্রতিবাদও করতে পারছি নে। লেখক প্রমাণ স্বরূপ (সুরা ও আয়াত সংখ্যার উল্লেখ না করেই) উল্লেখ করেছেন, "পরকালে আল্লাহ্ আবার তাদের দেহের বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে একত্রিত করিয়া বিচারের জন্য উত্থিত করিবেন।" কিন্তু পরকাল সম্বন্ধে এরূপ কথা আক্ষরিকভাবে গ্রহণীয় নয়; এগুলো রূপক আয়াত (আয়াতে মুতাশাবেহাত)। এরূপ আয়াত অবলম্বন ক'রে বাগবিতণ্ডা করার নিন্দা কোরানেই উল্লিখিত হ'য়েছে। ওগুলোকে কোরানের ভাষায় 'আহ্ওয়া' বা 'যন'—অনুমান বা কল্পনা বলা হয়েছে। যাহোক এসব ব্যাপারে (গূঢ় তত্ত্ব বা সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিচারে) আমার অধিকার না থাকায় মৃদু প্রতিবাদ উত্থাপন করেই ক্ষান্ত হ'লাম।

ফার্সী থেকে বাংলা তর্জমা মোটামুটি ভালই হয়েছে। তবে মাঝে মাঝে মূলের সঙ্গে বেশ কিছু পার্থক্য হ'য়েছে। অনেক স্থলে, যেখানে ভাবার্থ দেওয়া হ'য়েছে, সেখানে মূলের অনুগত থেকেই আরও সুন্দর বাংলায় তর্জমা করা যেত, আর তাতে অর্থটাও হয়ত আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠত। কিন্তু পাঠকের পক্ষে সবচেয়ে মুশকিলের ব্যাপার হয়েছে এই যে, মসনবীগুলো বাংলা হরফে লেখার ফলে প্রচুর ছাপার ভুল ঢুকেছে। এক শব্দের অক্ষর আর এক শব্দের গায়ে বসেছে, লিপ্যন্তরের ভুল হ'য়েছে; আর বিশেষ করে বহুবচনজ্ঞাপক চন্দ্রবিন্দু এক-স্থান হতে অন্যস্থানে গিয়ে বসেছে। এই সব কারণে মূলে কি ছিল সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হ'তে হ'লে ফার্সী অক্ষরে লিখিত মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার প্রয়োজন হয়। এর চেয়ে ডঃ এনামুল হক সাহেবের ভূমিকায় যেমন ফার্সী বাণীগুলো ফার্সী হরফেই লেখা হয়েছে এ বইয়েও মসনবীগুলো ফার্সী হরফে লিখলেই ভুল বুঝবার সম্ভাবনা কম হত। যাঁরা ফার্সী জানেন, তাঁরা আরও অধিক উপভোগ করতে পারতেন, আর যাঁরা ফার্সী জানেন না তাঁরা বাংলা হরফে

সাপের মন্ত্রের মত কতকগুলো বাণী (তাও অশুদ্ধভাবে) মুখস্থ করবার প্রলোভন থেকে অব্যাহতি পেতেন।

অন্ততঃ একস্থলে লেখক মূল ফার্সীর মর্ম অনুধাবন করতে না পারায় আনুমানিক অর্থ ধ'রে, সেজন্য 'মৌলবী'কেই দায়ী করেছেন। এ অবশ্য বে-আদবী, নিতান্ত অন্যায়। যেমন (পৃ: ৩০) :

جمله معشوق است عاشق پردهٔ
زنده معشوق است عاشق مردهٔ

এ শ্লোকটি হেঁয়ালী নয়। এর অর্থ হতে পারে :
"প্রেমাস্পদ (মা'শুক) (সমগ্র রাগিনারীর মত) অখণ্ড সত্তা; প্রেমিক (সেই রাগিনীর) একটি পর্দা মাত্র। প্রেমাস্পদ (মা'শুক) চিরন্তন; মিলনপ্রয়াসী (আ'শিক) নশ্বর জীব।" এই সুরই বোধ হয় মসনবীর কেন্দ্রে অবস্থিত। বাঁশীর রোদন, চক্ষু-কর্ণের সীমার ওপারে মনের ক্রন্দন, দেহ ও প্রাণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—ইত্যাদি ভাব এই কেন্দ্রিক ভাবের চার পাশে আবর্তিত হচ্ছে।

জনাব ইউসুফ নিজে কবি হয়েও মসনবীর গদ্যানুবাদ করেছেন। এটা সুবুদ্ধির কাজই হয়েছে। যে কোনও বিপ্লবাত্মক কাব্যের অনুবাদ করা অতিশয় কঠিন। তাই তিনি নিছক অনুবাদে সন্তুষ্ট না থেকে, 'মৌলবী'র গূঢ় ভাব বিস্তৃত ভাষ্যের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। আমার মনে হয় এই ভাষ্য, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যাদি, ইসলামী আদর্শের সহিত গ্রীক দর্শনের মিশ্রণ, গুরুবাদ সম্পর্কীয় আলোচনা—বেশ উচ্চাঙ্গের হ'য়েছে। তাতে মসনবীর ভাবধারা অনুসরণ করার পথ সুগম হ'য়েছে। এইটিই গ্রন্থকারের বিশেষ কৃতিত্ব। প্রতীকী কাহিনী-গুলোর মর্ম ব্যাখ্যাও মনোরম হ'য়েছে। বিশেষ ক'রে 'মৌলবী'র মত একজন প্রথিত-যশা সাধক ও দ্রষ্টার মসনবীতে মোটামুটি কি কি বিষয়বস্তু রয়েছে তার একটা সাধারণ পরিচয় দিয়ে বাঙালী পাঠকদের বিশেষ উপকার করেছেন—এতে ইসলামী ঐতিহ্য বুঝবারও সুবিধে হ'য়েছে। আর বর্তমানে আমাদের সমাজে গুরুবাদের যে

প্রাদুর্ভাব হয়েছে সে সম্বন্ধে মৌলানা রূমীর মত একজন শ্রেষ্ঠ সাধকের চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসলে এর প্রকৃত রূপ কি, গুরুভক্তি কতদুর চলতে পারে, আর কোথায় এর সীমারেখা টানতে হবে, সে ধারণা স্পষ্ট হয়। কোরান-শরীফের কোনও কোনও আয়াতের খণ্ডাংশ বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে শাসকবর্গ ও পীরগণ নিজ নিজ স্বার্থের দেওয়াল দৃঢ় করছেন। প্রধানতঃ কোরআনের যে সুরা অবলম্বন করে উপরওয়ালাকে তোয়ায করবার দাবী করা হয়, তার শেষাংশের দিকে লক্ষ্য করে লেখক মন্তব্য করেছেন, "এই নির্দেশ···সামাজিক সমস্যাদি সমাধানের এক ব্যক্তিত্ব নিরপেক্ষ উপায় মাত্র। আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও আনুগত্য ইসলাম স্বীকার করে না—এবং কোনও ব্যক্তির উপরই সে ঐশ্বরিক প্রভুত্বের মর্যাদা আরোপ করতে পারে না। কাজেই এই আয়াতের তাৎপর্য দাঁড়ায় যে, কোনও তর্কিত সমস্যায় আল্লাহ্র আদেশ যাতে সমাজ-জীবনে কার্যকর হয় তজ্জন্য 'উলিল আমর্' এর (ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের) আনুগত্য করা বিশ্বাসীদের কর্তব্য।"

এ পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল। বিভিন্ন বিষয়ক্ষেত্র থেকে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে :

(১) এই সব গুরুবাদী সম্প্রদায়ই খৃষ্টান ত্রিত্ববাদ ও সম্ভবতঃ ভারতীয় উৎস "হামাউস্ত" (সোহং বা অবতারবাদ) তত্ত্বকে ইসলামী চিন্তার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। অবতারবাদ ব্যতিরেকে 'ইমাম-বাদ'কে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। ······ পরম শ্রদ্ধেয় জুনায়াদ বাগ্দাদীর শিষ্য মনসুর হল্লাযের "আনাল হক" বাণীকে হামাউস্ত-এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রূপে মুসলমান ধরিয়া লইয়াছে। (পৃঃ ৩৮)

(২) নানা উপাখ্যানের ভিতর দিয়াই তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করিতে চাহিলেও মূলতঃ তিনি ছিলেন কবি এবং গীতিকবি। তাই কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে তাঁর আবেগপূর্ণ উচ্ছ্বসিত কবিমনের গীতিকবিজনোচিত মেজাজটি ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। রুমী যদি হাফেজের মত কেবলমাত্র গীতিকবিই হইতেন, তবে কাহিনী হইতে এই সকল প্রয়াণের মধ্যে

শুধু স্বগতোক্তিই ধ্বনিত হইত। কিন্তু রুমী একজন প্রথম শ্রেণীর গীতিকার হওয়া সত্ত্বেও দার্শনিক ছিলেন। (পৃঃ ৪৩)

(৩) প্রাচীরের ছায়া যেমন দীর্ঘতর হইয়া পুনরায় ছোট হইতে হইতে প্রাচীরের নীচেই ফিরিয়া আসে, কণ্ঠস্বর যেমন পর্বতের গাত্রে প্রতিহত হইয়া উচ্চারণকারীর কছেই প্রত্যাবৃত্ত হয়, তেমন প্রত্যেক কর্মের প্রতিফলও কর্মীর কাছে ফিরিয়া আসিবে। (পৃঃ ৫০)

(৪) অনুবাদঃ বুদ্ধি জিবরাইলের মত বলে, হে মুহম্মদ! (ছঃ) শুনুন, আমি যদি আর একপদও অগ্রসর হই তাহা হইলে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইব স্বর্গীয় দুত জিবরাইলের সঙ্গে কবি বুদ্ধিকে উপমিত করিয়াছেন। বুদ্ধি সম্পর্কে মৌলানার অভিমত যে বিরূপ নয় তাহা এই উপমা প্রয়োগেই বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। অধ্যাত্মপন্থীদের মধ্যে বুদ্ধিকে নস্যাৎ করিয়া দেওয়ার একটি প্রবণতা দেখা যায়। বুদ্ধি স্বর্গীয় জিবরাইলের মতই সত্যের সংবাদ বহন করে ও মেরাজের পথ প্রদর্শক হয়। তবু মানবাত্মার চূড়ান্ত সম্ভাবনার সামনেই তার গতিপথ সীমিত। (পৃঃ ১০৬)

(৫) ফুল যেমন কুঁড়ি হইতে পুষ্প-পরাগে বিকশিত হইয়া নিজেকে সফল করে, মানুষকেও তেমনি হইতে হইবে। কেন বিকশিত হইতে হইবে, পূজার জন্য দেবতার পায়ে নিবেদিত হইতে হইবে কিনা তাহা জানিবার প্রয়োজন ফুলের নাই। এই জানায় তার বিকাশের আনন্দই মাটি হইবার সম্ভব। (পৃঃ ১২৪)

(৬) বৈরাগ্য ও ভোগবাদ এই দুই মনোভাবের একটিও ইসলামী মনোভাব নয়—রুমীর এই মত। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও সার্বজনীন দায়িত্ব—পার্থিব জীবনের এইসব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে গিয়া ক্ষুদ্র অহংসত্তা হইতে ব্যক্তির যে মুক্তিলাভ ঘটে ও জীবন সম্পর্কেও তার মধ্যে যে এক বিশ্বজনীন নূতন অনুভূতির জন্ম হয়, তারই বিকাশ ইসলামের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার সাধনাই ধর্মের সাধনা। ইহা একান্তভাবেই বৈরাগ্যের পরিপন্থী ও জীবনের সহায়ক। (পৃঃ ১৩৫)

(৭) চির অশান্ত মানবাত্মার এই বিরহবোধ যার মধ্যে জাগিয়াছে, মসনবী কাব্য তারই জন্য। তারই জন্য এর অসংখ্য কবিতা কাহিনী ও সাদৃশ্য-উপমা। তারই জন্য আত্মিক শিক্ষক ও জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের অনুসন্ধানের সমস্যা। মসনবী কাব্যের পাঠকের চোখে জাগিয়া উঠিতেছে অতিক্রান্ত এক দীর্ঘ পথরেখা; সেই পথের পাশে জাগিয়াছে অজ্ঞানতা ও লোকাচারের অন্ধকার অরণ্যানী, সেই পথে আছে নরকসদৃশ প্রবৃত্তির ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড; ছলনা, মোহ, লোভ ও লালসার জাল পাতা রহিয়াছে সেই পথের দু'ধারে। কিন্তু পাঠকের মনে সেই অতিক্রান্ত পথের যে স্মৃতি জাগে তা ভয় কিম্বা আত্মনিগ্রহ নয়, সেই স্মৃতি ফোরাতের অমল জলধারার মত,—সুগন্ধবাহী দখিনা বাতাসের মত। সেই স্মৃতির সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে এক মধুর বেদনা, এক অপার্থিব পরম আকাঙ্খা। (পৃঃ ১৬৮)

এই উদাহরণগুলোর থেকে প্রকাশ পাচ্ছে লেখক-কবির ভাষা, প্রকাশভঙ্গী, মনোভঙ্গী এবং মৌলবীর মসনবীর সুরের সঙ্গে সহস্পন্দনশীল একটি মরমী প্রাণ। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শের একটা বিস্মৃত-প্রায় সুরকে উদ্ঘাটিত ক'রেছেন ব'লে আমি কবি মনীরুদ্দীন ইউসুফ সাহেবকে স্বাগত জানাই।

কাজী মোতাহার হোসেন